ঘুরে এলাম দ্বীপ কন্যা কুকরি-মুকরি

ড. মোহাম্মদ ইদ্রিস

বালিয়া দ্বীপে চারদিকে সবুজের সমারোহ। উত্তরে মেঘনা অববাহিকা, দক্ষিণে নারকেলগাছ সুশোভিত সমুদ্র সৈকত। পশ্চিম ও পূর্ব দিগন্তে বিশাল ম্যানগ্রোভ বন, দূর থেকে ভেসে আসা পাখ-পাখালীর গান। বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর অববাহিকা ও বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে জেগে উঠা কোলাহলমুক্ত ছোট্ট একটি দ্বীপ কুকরি-মুকরি দ্বীপ। এটি বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য চোখ জুড়ানো দর্শনীয় স্থান।

বর্তমানে কুকরি মুকরি দ্বীপে বনভূমির পরিমাণ ৮৫৬৫ হেক্টর, যার মধ্যে ২১৭ হেক্টর জমি বন্য প্রাণীর অভয়াশ্রম। কুকরি-মুকরি দ্বীপ বাংলাদেশের অন্যতম সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও বৃহৎ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। এই দ্বীপটি জেলা শহর থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরে। বঙ্গোপসাগরের উপকণ্ঠে মেঘনা ও তেতুলিয়া নদীর মোহনায় কয়েকশ বছর আগে জেগে ওঠা দ্বীপ এটি। জানা যায় পর্তুগিজ ও ওলন্দাজরা দস্যুবৃত্তি লুটতরাজ করে এই চরে আশ্রয় নিত। ঐতিহাসিকভাবে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও ধারণা করা হয় ১৯১২ সালে তৎকালীন জার্মান যুবরাজ প্রিন্স ব্রাউন জনমানবহীন এই চরে জাহাজ নিয়ে আসেন শিকারের উদ্দেশে। তিনি দেখতে পান এখানে একটি বিড়াল ও কুকুর ছোটাছুটি করছে। সেই দৃশ্যাবলী তাকে মনে করিয়ে দেয় নির্জন এই চরের নামকরণ। পরে জার্মানের অনূদিত রূপ হিসেবে বাংলায় যার নামকরণ হয়ে যায় চর কুকরি-মুকরি। স্থানীয়দের কাছে থেকে জানা যায়, এক সময় এই দ্বীপে শুধু কুকুর আর বিড়াল (স্থানীয়দের কাছে যা মেকুর নামে পরিচিত) ছাড়া আর তেমন কিছুই চোখে পড়তো না, যা বর্তমানেও চোখে পড়ার মত। এজন্য এ দ্বীপের নামকরণ করা হয় কুকরি-মুকরি। বর্তমানে চর কুকরি-মুকরির বনে যেসব প্রাণী দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে চিত্রা হরিণ, বানর, উদবিড়াল, শিয়াল প্রভৃতি। আর পাখি ও সরীসৃপ হিসেবে এই বনে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির বক, বনমোরগ, শঙ্খচিল, মথুরা, কাঠময়ুর, কোয়েল, গুঁইসাপ, বেজি, কচ্ছপ ও নানা ধরনের সাপ। শীতকালে দেখা মিলে হাজার হাজার অতিথি পাখির। কুকরি মুকরি দ্বীপে হরিণ ও পাখি দেখতে হলে আপনাকে খুব ভোরে উঠতে হবে।

এই দ্বীপকে প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে রক্ষা করতে জেগে ওঠা চরগুলো সংরক্ষণে ১৯৪৭ সাল থেকে এখানে বনায়ন করা হয়। ওই কর্মসূচিই পরবর্তী সময়ে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প হিসেবে রূপলাভ করে। বর্তমান কুকরি-মুকরি দ্বীপ

চরফ্যাশন উপজেলার অধীনে একটি ইউনিয়ন। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে আবার কুকরি-মুকরি দ্বীপ এলাকায় প্রশাসনিক উদ্যোগে বনায়নের কাজ শুরু হয়। এই সময় মূলত শ্বাসমূলীয় গাছের চারা রোপণ করে বনায়ন শুরু করা হলেও পরে ক্রমে ক্রমে যুক্ত হয় সুন্দরী, গেওয়া, পশুর প্রভৃতি গাছের চারা রোপণ করা। এছাড়া গোটা এলাকায়ই চোখে পড়ে বিপুলসংখ্যক কেওড়া গাছ। মূলত বিশাল এলাকায় গড়ে ওঠা এসব গাছ, আশপাশের নারিকেল গাছ, বাঁশ ও বেত বন মিলেই এখানেই তৈরি হয়েছে আকর্ষণীয় একটি ম্যানগ্রোভ শ্বাসমূলীয় বনাঞ্চল।

কুকরি-মুকরি দ্বীপে প্রধান সড়ক একটি যা দ্বীপের পশ্চিম-দক্ষিণ দিক থেকে পূর্ব-উত্তর দিকে সোজা চলে গেছে এ সড়কটির দৈঘ্য প্রায় ১০ কিলোমিটার। খেয়া ঘাট থেকে ইট বিছানো আরো একটি পথ প্রায় ৫ কিলোমিটার চলে গেছে উত্তর-পূর্ব দিকে। খেয়া ঘাট থেকে ব্রীজ পার হয়ে পূর্ব দিকে আরো একটি পথ প্রায় ৫ কিলোমিটার চলে গেছে নারকেল বাগানের দিকে। বাজার আছে তিনটি, কুকরি -মুকরি দ্বীপের প্রধান বাজারের নাম হলো পুরাণ বাজার। কুকরি-মুকরি দ্বীপে বিদুৎ নেই তবে পুরাণ বাজারে রাত দশটা পর্যন্ত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদুৎ থাকে। দ্বীপের ভিতরে যাতায়াতের জন্য সল্পতা রয়েছে। দ্বীপে ঘুরার জন্য ইদানিং কিছু মটর সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়।

যেতে পারবেন যেভাবে: রাজধানী ঢাকা থেকে চরফ্যাশন উপজেলার দূরত্ব ২২৫ কিলোমিটার এবং জেলা সদর ভোলা থেকে দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার। ভোলা জেলাটি একটি দ্বীপাঞ্চল হওয়ায় এখানকার যেকোনো স্থানে আসার জন্য নৌপথ সবচেয়ে সুবিধাজনক পরিবহন ব্যবস্থা। তবে, সড়ক পথেও এখানে আসা সম্ভব; সেক্ষেত্রে ফেরী পারাপার হতে হয়। রেল এবং বিমান পথে এখানে সরাসরি পৌছানোর কোনো সুযোগ এখনও গড়ে ওঠেনি। ঢাকার গুলিস্তান, যাত্রাবাড়ি মহাসড়কে হয়ে লক্ষ্মীপুর এসে মজুচৌধুরীর ঘাট পার হয়ে ভোলা ইলিশা ঘাট হয়ে চরফ্যাশন যাওয়া যায়। ঢাকা থেকে মাওয়া ফেরিঘাট হয়ে বরিশাল এসে সেখান থেকে অথবা লঞ্চ অথবা বাস যোগে চরফ্যাশন উপজেলায় যাওয়া যায়। সহজ পথে ঢাকা সদরঘাট থেকে লঞ্চে সরাসরি ভোলা বা চরফ্যাশনের বেতুয়া লঞ্চঘাট আসা যায়; এতে সময় লাগে প্রায় ৮ ঘণ্টা। এরপর চরফ্যাশন থেকে বাসে করে দক্ষিণ আইচা, সেখান থেকে অটোরিকসায় কচ্ছপিয়া ঘাট। কচ্ছপিয়া ঘাট থেকে ট্রলারে কুকরি-মুকরি দ্বীপে পৌঁছানো য়ায়।

যাত্রা শুরু যেভাবে: কুকরি-মুকরি দ্বীপে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল অনেক দিন থেকে কিন্তু নানা ব্যস্ততার কারণে কয়েক বার পরিকল্পনা নিয়েও যেতে পারিনি। গত ১২ অক্টোবর'২১ মঙ্গলবার আসাদ সাহেবের আহবানে সারা দিয়ে রাত দশটায় নবীন বরণ গাড়ীতে বরিশাল লঞ্চ ঘাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এই চচ্ছেন সেই আসাদ সাহেব; যার সাথে তিন বছর যশোর শহরে একই বাসায় থাকার কারণে অকৃতিম বন্ধু হিসাবে তার সাথে দক্ষিণ বঙ্গের খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৬ জেলায় বেশ ঘুরে বেড়িয়েছি। পরদিন ভোর সারে চারটায় বরিশাল লঞ্চ ঘাটে পৌঁছে গেলাম। সফর সঙ্গী হিসাবে আরো আরো যাদেরকে পেয়ে গেলাম তাঁরা হলেন যশোরের জনাব মুত্তালিব হোসাইন, জনাব ইমরান হোসেন ও জনাব রবিউল ইসলাম।

লঞ্চে বরিশাল থেকে ভোলা: ১৩ অক্টোবর'২০২১ বুধবার ভোর পাঁচটায় আমাদের এমভি রুবেল-৪ লঞ্চ বরিশাল ঘাট থেকে যাত্রা শুরু করল। বরিশাল থেকে ভোলায় পৌঁছানোর কথা সকাল সাত টায়। বরিশাল থেকে ভোলার উদ্দেশ্যে প্রতি ঘন্টায় বিভিন্ন নামের লঞ্চ চলাচল করে। লঞ্চের সিঙ্গেল বেড কেবিনের ভাড়া ২৫০ টাকা, ডবল বেড কেবিনের ভাড়া ৪০০ টাকা, ডেকের ভাড়া ৯০ টাকা। লঞ্চে প্রতিদিন উপকূল অঞ্চলের নানা পেশার মানুষ যাতায়াত করে। লঞ্চের নামাজ ঘরে ফজরের নামাজ আদায় করার পর চার পাশের দৃশ্য অবলোকন করতে ছিলাম। লঞ্চে কথা হলো ভোলা বোরহানুদ্দিন উপজেলার আবদুল মাজেদ নামের এক মুরব্বীর সাথে, পেশায় তিনি একজন ব্যবসায়ী, প্রতি নিয়ত ব্যবসায়িক কাজে তিনি লঞ্চে বরিশালে যাতায়াত করেন। তার কাছ থেকে 'ধান নদী আর খাল এই তিনে বরিশাল' নদী পথের বিচিত্র খাল ও ঘাটের কথা শুনতে শুনতে থেকে চরমোনাই ঘাটে এসে পৌঁছে গেলাম।

সকালের কলা ও রুটি দিয়ে হালকা নাস্তা করার পর লঞ্চের ডেকে নীচে গেলাম। এখানে বাজার-দোকান, খাবার হোটেল ও চায়ের দোকান রয়েছে। ভোলার দৌলত খাঁ, হাকিমুদ্দিন, তজিমুদ্দিন, চরফ্যাশন ও মনপুরার প্রায় দের হাজার মানুষ এ লঞ্চে যাতায়াত করে। কথা হলো দৌলত খাঁনের আব্দুল আলিম নামের এক যুবকের সাথে সে যশোর থেকে বাড়ী ফিরছে। কথা হলো তজিমুদ্দিনের সুপারী ব্যবসায়ী রমেশ নামের এক ব্যক্তির সাথে, যারা জীবন-জীবিকার টানে এখানে যাতায়াত করেন। নদী পথে জীবন-জীবিকার কথা শুনতে শুনতে সকাল সারে সাতটায় বরিশালের

ভেদুরিয়া লঞ্চ ঘাটে পৌঁছে গেলাম। ভেদুরিয়া লঞ্চ ঘাট হতে ভোলা বাস টার্মিনালে সি.এস.জি চালিত অটো-রিকসার ভাড়া জনপ্রতি ৪০ টাকা হলেও আমরা এখান থেকে জন প্রতি ১৫ টাকা ভাড়ায় মিনিবাসে করে ভোলা বাস টার্মিনালে পৌঁছে গেলাম।

ভোলা থেকে কুকরি মুকরি দ্বীপঃ ভোলা বাস টার্মিনালে আবারও সকালের নাস্তা করে আমরা সকাল সারে আটটায় চরফ্যাশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। বাইকে ওঠার পর থেকেই শুরু হল ছায়া স্নিগ্ধ সুশোভিত এক নতুন পথ চলা। ভোলার সদর, বুরহান উদ্দিন ও লালমোহনের সরু পথে রয়েছে সবুজ গাছ-পালা, ফসল আর নারকেল-সুপারীর বাগান। দেখতে দেখতে আমরা প্রায় দেড়ঘন্টা পর সকাল ১০টায় চরফ্যাশনে পৌঁছে গেলাম। চরফ্যাশনের বাজারে মনপুরা দ্বীপের সোহাগ নামের একটি ভাইকে আমরা সফর সঙ্গী হিসাবে পেয়ে গেলাম। চা নাস্তা সেরে চরফ্যাশনের বাজার থেকে ২৫ টাকা বাস ভাড়ার বিনিময়ে আমরা দক্ষিণ আইচায় পৌঁছে গেলাম। দক্ষিণ আইচা থেকে ১৫ টাকা ভাড়ায় অটো-রিকসায় করে কচ্ছপিয়া ঘাটে পৌঁছে গেলাম বেলা সারে বরোটায়। ততক্ষণে আমাদের কাংখিত চর কুকরি মুকরি দ্বীপের ট্রলার ছেড়ে চলে গেছে; তাই বিকার ৪টা পর্যন্ত অপেক্ষা ছাড়া আমাদের কোন উপায় রইল না। অবশেষে কচ্ছপিয়া ঘাটে তিন ঘন্টা অপেক্ষা করে গোসল যহোরের সালাত আদায় করে চিংড়ি মাছ দিয়ে দুপুরের লান্স শেষ করে বিকার ৪টার ট্রলারে সপ্নের দ্বীপ কন্যা কুকরি-মুকরির দিকে রওয়ানা হলাম। দের ঘন্টা পর মাগরিবের আযানের সময় আমরা সপ্নের দ্বীপ কন্যা কুকরি-মুকরিতে পৌঁছে গেলাম।

কুকরি-মুকরিতে অনেকগুলো আবাসিক হোটেল ও একটি থ্রী স্টার মানের সরকারী রিসোর্ট রয়েছে। তা ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ ভবনেও থাকার ব্যবস্থা আছে। সেখানকার চেয়ারম্যান বা তার সেক্রেটারির সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এছাড়া বাজারের আশে-পাশে যে কোন বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা আছে। তবে সবচেয়ে সহজ আর আকর্ষণীয় ব্যবস্থা হলো চরে ক্যাম্প করে থাকা। এতে খরচ যেমন বাঁচবে, সাথে পাবেন প্রাকৃতিক এক অন্যরকম ভিন্ন পরিবেশ। ক্যাম্প করার জন্য এখানে আছে বিশাল জায়গা। আপনি যেখানে ইচ্ছা ক্যাম্প করতে পারবেন। তবে বনের ভিতরে ক্যাম্প করা থেকে বিরত থাকবেন। মূল চরের আগে একটি খাল আছে তা পার হয়ে সামনের কিছু জায়গা আছে বনের পাশে, গাছের ছায়ায় সেখানেও ক্যাম্প করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই স্থানীয় কারো কাছে জোয়ারের

পানি কতদূর পর্যন্ত আসে তা জেনে নিবেন। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের মাঠেও ক্যাম্প করতে পারেন। সাইক্লোন শেল্টার ও দুটি এনজিওর অফিস আছে সেখানেও থাকতে পারবেন।

চরফ্যাশনে খাবারের জন্য বেশ কিছু স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে খাবার ঘর; আনন্দ রেস্তোরা; বনফুল ইত্যাদী। চর কুকরি-মুকরি বাজারেও তিনবেলা ভালো খাবারের ব্যবস্থা আছে। স্থানীয়দের হাতের রান্না করা খাবার পাবেন আশে-পাশে সবখানেই। সম্ভব হলে বাজার থেকে তাজা মাছ কিনে রাঁধতে দিন, দামে সস্তা আর স্বাদেও টাটকা। অর্ডার দিলে আপনার মন মত মেনু রেডি করে দিবে। ব্যাকপ্যাকিং করেও নিজেরা রান্না করে খেতে পারবেন। এই চরে লাকড়ির অভাব নেই। আশেপাশে হাঁটলেই তিন চারদিনের লাকড়ি যোগাড় হয়ে যাবে। নদীর পানি লবণাক্ত তাই পান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

মাগরিবের নামাযের পর আমরা সপ্নের দ্বীপ কন্যা কুকরি-মুকরিতে পৌঁছে সরকারী রিসোর্টে প্রবেশ করলাম। প্রথমে কুকরি-মুকরি বাজার এরপর খেয়াঘাটে আমরা অবস্থান করলাম। খেয়াঘাটের পাশে একটি বাড়ীতে আমাদের রাতের ও সকালের খাবারের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে খেয়াঘাটের একটি বাঁশের মাচালে আমরা বসে বসে দ্বীপ এলাকার মানুষের কথা শুনলাম। যেহেতু বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই, তাই গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। গ্রামীণ পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের মাছ দিয়ে রাতের আহার গ্রহন করার পর যানবাহন ঠিক করে পরবর্তী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। এ ক্ষেত্রে কুকরি-মুকরিতে কর্মরত এন. জি,ও কর্মকর্তা জনাব মিজানুর রহমান সাহেব হোটেলে বুকিং, খাবার ব্যবস্থা আমদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন।

যেহেতু চর এলাকা তাই গাড়ির ভাল ব্যবস্থা নাই, যাদের হাঁটার অভ্যাস নাই বা অনিহা তারা না যাওয়াই ভালো। বনের বেশি গহীনে যাবেন না, আর গেলেও অন্তত দু জন নিয়ে যাবেন যেন পথ হারিয়ে না ফেলেন। যেহেতু বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য, তাই তাদের চলার পথে বাধার সৃষ্টি করবেন না বা প্রাণীকে ভয় দেখাবেন না। শিয়ালের উৎপাত বেশ ভালোই এই চরে তাই রাতে তাবু থেকে নিরাপদ দূরত্বে ক্যাম্প ফায়ার করবেন অবশ্যই। হরিণ শিকার থেকে বিরত থাকবেন, ইহা দণ্ডনীয় অপরাধ। সরীসৃপ প্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে অতিরিক্ত সতর্কতাস্বরূপ ক্যাম্প গ্রাউন্ডের চারিপাশে কার্বলিক এসিড ছিটিয়ে দিন। খাবার দাবারের ঝুটা নদীতে বা বালুতে গর্ত করে পুতে রাখা উচিত।

প্রকৃতির ওপড় কোন খারাপ প্রভাব পড়ে এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। হৈ হুল্লোর, চিল্লাচিল্লি থেকে বিরত থাকতে হবে। খালি পায়ে বনের ভিতর হাঁট যাবে না। এই অঞ্চলে সব জায়গায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই, তাই অবশ্যই পাওয়ার ব্যাংক সাথে রাখুন। আর বাজারে সোলার পাবেন সেখানেও মোবাইল চার্জ করতে পারেন। স্থানীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করুন, তাদের অমায়িক ব্যবহারে আপনি নিজেও মুগ্ধ হবেন। যে কোন সমস্যায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। নদীতে গোসলে সতর্কতা অবলম্বন করুন, সাতার না জানলে

বেশি দূর যাওয়া থেকে বিরত থাকুন।গ্রামীনফোন নেটওয়ার্ক পাবেন এই দ্বীপে তাই এরকম অপারেটর এর সিম সচল রাখুন।

১৩ অক্টোবর'২০২১ বৃহঃবার দ্বীপে হরিণ ও পাখি দেখার জন্য খুব ভোরে উঠে রওয়ানা হলাম। হরিণের দল দেখতে পূর্ব দিকেরশেষ মাথা বেশী ভাল, ঐদিকটায় হরিণের দল বেশী দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে রওয়ানা হলাম পূর্ব খালের দিকে সেখান থেকে নারকেল বাগান, নারকেল বাগান থেকে সকাল সকাল আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। গোসল সেরে কাপড় পরিধান করার পর নাস্তা করতে করতে মনপুরার সোহাগ ভাইয়ের সাথে আবার অনেক কথা হলো। ভাইয়ের পরামর্শ মতে আমরা পানি পথে ঢাকায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। মিজান ভাই আবার আমাদের সকাল নয়টার ট্রলারে উঠায়ে দিয়ে আমাদেরকে বিদায় দিলেন। বেলা ১২ টায় আমরা কচ্ছপিয়া ঘাটে এসে পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে তারাতারি চরফ্যাশন উপজেলা শহরে পৌঁছাতে হবে, তাই মটর সাইকেল যোগে আমরা চরফ্যাশনের উদ্দশ্যে রওয়ানা হলাম। বেলা ১ টায় আমরা জ্যাকব টাওয়ারের পাদদেশে পৌঁছে গেলাম।

জ্যাকব টাওয়ার: জ্যাকব টাওয়ার চরফ্যাশন শহরে অবস্থিত পর্যটকদের জন্য নির্মিত একটি ওয়াচ টাওয়ার। জ্যাকব ওয়াচ টাওয়ার ভোলা জেলা শহর থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেঁষে ওয়াচ টাওয়ারটি অবস্থিত। এ টাওয়ার থেকে চারপাশের ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায। এটি বাংলাদেশ ও উপমহাদেশের সবচেয়ে উঁচু ওয়াচ টাওয়ার। আইফেল টাওয়ারের আদলে নির্মিত ১৬ তলা বিশিষ্ট এই ওয়াচ টাওয়ারে প্রতিটি তলায় ৫০ জন ও পুরো টাওয়ারে ৫০০ জন দর্শক অবস্থান করতে পারবেন। ভোলা জেলা শহর থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেঁষে উপজেলা শহর চরফ্যাশন কলেজ রোডে খাসমহল মসজিদের সামনে ওয়াচ টাওয়ারটি অবস্থিত। নামকরণ নির্মাণের শুরুতে এর নাম জ্যাকব টাওয়ার ছিলো না। গত ১৮ মে ২০১৭ নির্মাণাধীন টাওয়ার পরিদর্শনে এসে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ সাহেব টাওয়ারটির নির্মাণশৈলী আর নান্দনিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তিনি এর নাম দেন 'জ্যাকব টাওয়ার'। ভোলা-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের নামে টাওয়ারটির নামকরণ করা হয়।

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই টাওয়ার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। টাওয়ার নির্মাণে ব্যয় হয় প্রায় ২০ কোটি টাকা। এর উচ্চতা ২২৫ ফুট। ১ একর জমিতে টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে চরফ্যাশন পৌরসভা। ভূমির উপর থেকে টাওয়ারের ওপরে অবস্থিত গম্বুজ আকৃতির ওয়াচ পয়েন্ট পর্যন্ত চারদিকে অ্যালুমিনিয়ামের ওপর রয়েছে ৫ মিলিমিটার ব্যাসের স্বচ্ছ কাঁচ। এর চূড়ায় ওঠার জন্য সিঁড়ির পাশাপাশি রয়েছে ক্যাপসুল লিফট। টাওয়ার চূড়ায় স্থাপন করা হয়েছে উচ্চক্ষমতার বাইনোকুলার। এর সাহায্যে পর্যটকরা দূরবর্তী স্থান দেখতে পারবেন। আবহাওয়া ভাল

থাকলে জ্যাকব টাওয়ারের শীর্ষ থেকে আশেপাশে প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দেখা যায়। এখানে থেকে দেখা যাবে সংরক্ষিত বনাঞ্চল চর কুকরি-মুকরি, তারুয়া সৈকত, স্বপ্নদ্বীপ মনপুরার চর পিয়াল, হাতিয়ার নিঝুম দ্বীপ আর বঙ্গোপসাগর। জ্যাকব টাওয়ার ছাড়াও চরফ্যাসন উপজেলার রয়েছে শেখ রাসেল শিশু পার্ক, তারুয়া সমুদ্র সৈকত, বেতুয়া লঞ্চঘাট ও খামার বাড়ী সহ বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান।

তারুয়া সমুদ্র সৈকতঃ চরফ্যাসন উপজেলার জ্যাকব টাওয়ারের পাশেই রয়েছে একটি অন্যতম বিনোদনের স্থান শেখ রাসেল শিশু পার্ক। এখানে অনেক গুলো রাইটার আছে এবং প্রযুক্তি নির্ভর ভার্টুয়াল থিয়েটার আছে যাহা পর্যাটনদের আকর্ষণ করে। এখানে পর্যাটনদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থাও রয়েছে। চরফ্যাসন উপজেলার একটি ইউনিয়ন হচ্ছে ঢালচর। এই ঢালচর ইউনিয়নে রয়েছে একটি সুমদ্র সৈকত তার নাম তারুয়া সুমদ্র সৈকত। প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য আর পাখিদের অভয় আরণ্য এই সুমদ্র সৈকতটি পর্যাটকদের আকর্ষণ করে থাকে। জলা সদর থেকে দেড়শ কিলোমিটার দূরে তারুয়া সমুদ্র সৈকতের অবস্থান; একশত পয়ত্রিশ কিলোমিটার পাকা সড়কের পর পনের কিলোমিটার নৌ-পথ পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। যাতায়াত ব্যবস্থা দুর্গম হওয়ার তারুয়া সমুদ্র সৈকতের পরিচয় সবার নিকট মেলেনি।

খামার বাড়ীঃ চরফ্যাসন উপজেলার একটি অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে বেতুয়া লঞ্চঘাট। উপজেলা সদর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দুরে লঞ্চঘাটটি অবস্থিত। এখানে প্রতিদিন অসংখ্য পর্যাটন বেড়াতে আসে। এখানে একটি অত্যাধুনিক লঞ্চঘাট থেকে প্রতিদিন বিকাল ৫টায় ও সারে ৫টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে দুটি লঞ্চ ছেড়ে যায়। এখানেও পর্যাটনদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা আছে। চরফ্যাসন উপজেলার একটি অন্যতম আকর্ষন হচ্ছে খামার বাড়ী। প্রকৃতিক ফুল-ফল দেখার জন্য এখানে প্রতিদিন অসংখ্য পর্যাটন ভ্রমণে আসে। নানা জাতের গোলাপ, রজনীগন্ধা, গাঁদা ইত্যাদী ফুলের সমোরাহ ঘটেছে খামার বাড়ীতে। নানা জাতের গাছ-গাছালী দ্বারা আচ্ছাদিত এ খামার বাড়ী।

বিদায় বেলাঃ দুই দিনব্যাপী ভ্রমণ শেষে এবার বিদায়ের পালা। চরফ্যাসন উপজেলার যে সকল স্থাপনা ও নিদর্শনাদি রয়েছে সেগুলো পরিদর্শন শেষে আমরা ঢাকার পথে রওয়ানা হলাম। পিছনে পড়ে রইল মায়াময় কুকরি-মুকরি দ্বীপ, নারকেল বাগান, পুরান বাজার, রিসোর্ট, খেয়াঘাট, চরফ্যাসন শহর, জ্যাকব টাওয়ার, শিশু পার্ক, তারুয়া সমুদ্র সৈকত, বেতুয়া লঞ্চঘাট, খামার বাড়ী ও ভোলার ভেদুরিয়াঘাট। স্মৃতিময় হয়ে রইল চরফ্যাসনের মিজান ভাই, মনপুরার সোহাগ ভাই, মুত্তালিব ভাই, রবিউল ভাই, ইমরান ভাই, ট্রলার, সি-ট্রাকসহ অনেক কিছু।

লেখকঃ সহকারী অধ্যাপক, সাঁথিয়া মহিলা ডিগ্রি কলেজ, সাঁথিয়া, পাবনা। ই-মেইলঃ drmidris78@gmail.com